KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

ছিন্নমূলের অস্তিত্বের সংকট : দেশভাগ- পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু নারীদের জীবন সংগ্রাম

উষসী চৌধুরী
সহকারি অধ্যাপক, চাঞ্চল কলেজ ইতিহাস বিভাগ

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালের দেশভাগের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু মহিলাদের জীবনে নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুই ভাবেই দেখা দিয়েছে। দেশভাগ ওপার বাংলার হাজার হাজার নারীদের জীবনে নিয়ে এসেছিল নির্যাতন ও লাঞ্ছনা,পশ্চিমবঙ্গে এসেও যা শেষ হয় নি। প্রাথমিক ভাবে তাঁদের নানা দুর্দশা সহ্য করতে হলেও, পরবর্তীকালে তাঁরা নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সংসারের আর্থিক কষ্ট ঘোচানো তাদের কর্মজগতে প্রবেশের মূল কারণ হলেও, এখানে তাঁরা খুজে পেয়েছিলেন নিজস্ব দুনিয়া। তাঁরা পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছেন কিন্তু থেমে যাননি। শিক্ষাবিভাগ থেকে বিনোদনের দুনিয়া, কর্মজগতের সমস্ত ক্ষেত্রে তারা রেখেছেন সাফল্যের নজির। লেখাপড়ার সুযোগ যারা পাননি তাঁরাও নিজেদের সাধ্যমতো স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন । তাঁরা পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছেন কিন্তু থেমে যাননি। দেশভাগ পরবর্তীকালে ঘরে -বাইরে তাদের সংগ্রামের কথা, এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ : দেশভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, উদ্বাস্তু, নারী, কর্মজগত।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস ভারতীয় উপমহাদেশে বয়ে এনেছিল দ্বিবিধ সংবাদ। একদিকে ছিল দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর বহুপ্রতীক্ষিত স্বাধীনতালাভের অনাবিল আনন্দ, অন্যদিকে ছিল দেশভাগের যন্ত্রণা, বৃহৎসংখ্যক মানুষের মাথার ছাদ হারানোর, মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বেদনা। হাসি-কান্নার এই দোলাচলের মধ্য দিয়েই জন্ম হল দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের- ভারত ও পাকিস্তানের। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর শপথবাক্যে পাঠ করলেন- "বহু বৎসর পূর্বে আমরা নিয়তির সঙ্গে আভিসারের সংকল্প নিয়েছিলাম এবং এখন সেই সংকল্প পূরণের সময় এসেছে ....মধ্যরাতের এই ঘণ্টাধ্বণিতে যখন সমস্ত পৃথিবী ঘুমন্ত তখন ভারত জেগে উঠেছে জীবন ও স্বাধীনতায়"।[১] 'মধ্যরাতের শিশু' এই ভারতবর্ষকে জন্ম থেকেই লড়াই করতে হয়েছে হাজার সমস্যার সাথে ,তার মধ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা ছিল এক বড়ো সমস্যা। পাঞ্জাবে লেনদেনের মাধ্যমে সমস্যার অনেকখানি সমাধান হলেও, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা ছিল বেশ গভীর। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর হিসেব অনুযায়ী "২.৭০ মিলিয়ন হৃতসর্বস্ব মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। মানবেতিহাসে এই অভিপ্রয়াণ অশ্রুতপূর্ব"।[২] অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত তাঁর 'ইতিহাস ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনটি সময়ের কথা বলেছেন – 'বড়ো সময়', 'ছোট সময়' ও 'ব্যক্তিগত সময়'। ইতিহাস 'বড়ো সময়' এর কথা বললেও তার অধীনে থাকা 'ছোট সময়' ও 'ব্যক্তিগত সময়' এ সাহিত্যিকের অবাধ বিচরণ ঘটে থাকে। দেশভাগের 'ছোট সময়' ও 'ব্যক্তিগত সময়' এর অজস্র নিদর্শন

ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধে। অতীন বন্দোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম', জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা', প্রফুল্ল রায়ের ' কেয়াপাতার নৌকো', হাসান আজিজুল হকের 'আগুন পাখি', খুশবন্ত সিং এর 'এ ট্রেন টু পাকিস্তান', সাদাত হাসান মান্টোর অসংখ্য ছোটগল্প প্রভৃতি আরও অজস্র সাহিত্যিক নিদর্শনে ধরা পড়েছে দেশভাগের টুকরো -টুকরো বিভিন্ন ঘটনার চিত্র। একাধিক বাংলা চলচ্চিত্রে চিত্রায়িত হয়েছে দেশভাগের বিভিন্ন ঘটনা, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল- নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল', ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক','মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', কোমল গান্ধার'। নারীদের ক্ষেত্রে দেশভাগের অভিজ্ঞতা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। বাস্তবেও ঝিনুক, মালতী, সুতারা, দুর্গাদের কঠিন পরিস্থতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তাৎক্ষণিক ভাবে উদ্বাস্তু নারীদের উপর দেশভাগের প্রভাব নেতিবাচক হলেও ধীরে ধীরে মেয়েরা বাঁচতে শেখে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে, বহির্জগতের সাথে পরিচিত হয় তারা।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীদের পরিবার, সম্প্রদায় ও জাতির সম্মান রূপে ধরা হয়। তাই ইতিহাসে বারবার দেখা যায় প্রতিপক্ষকে অসম্মান জানানোর মাধ্যম হিসেবে নারীদের সম্মানকেই নিশানা করা হয়। দেশভাগের সময়ও দুই প্রান্তেই প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ের হাতে নারীদের লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হতে হয়েছে। ১৯৯০ এর দশক থেকে বেশ কিছু গবেষকের গবেষণায় এই বিষয়টি উঠে এসেছে। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, জয়া চ্যাট্টার্জী, যশোধরা বাগচী,গার্গী চক্রবর্তী, দীপেশ চক্রবর্তী, উর্বশী বাটুলিয়া প্রমুখ গবেষক এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পশ্চিমে পাঞ্জাব এবং পূর্বে বাংলা দু প্রান্তে অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যালীলার শিকার হতে হয়েছিল। প্রায় ২৫ থেকে ২৯ হাজার হিন্দু মহিলা ও ১২ থেকে ১৫ হাজার মুসলিম মহিলাদের নিজেদের জীবনের বলি দিতে হয়েছিল। রাওয়ালপিণ্ডির কাছে এক গ্রামে প্রায় ৯৬ জন মহিলা কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের প্রাণবিসর্জন দিয়ে ধর্মান্তরিতকরণ এড়ান। এই ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় ভীষ্ম সাহানির 'তমস' উপন্যাসে পরে গোবিন্দ নিহলানি দূরদর্শনে যার চিত্রায়ণ ঘটান। দেশভাগের আগে নোয়াখালির দাঙ্গায় একশোরও বেশি মহিলাকে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিল। হিন্দু বিবাহিতা রমণীদের জোর করে শাঁখা, সিঁদুর মুছিয়ে কলমা পড়তে বাধ্য করা হয়। বাংলা ও পাঞ্জাব, দু -প্রান্তেই অবিবাহিতা মেয়েদের অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে অপরপ্রান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হত।[৩]

দুঃসহ বেদনা, যাতনা, বাধা, বিপত্তি অতিক্রম করে ওপার বাংলার মহিলারা যখন পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছলেন, এখানে তাদের স্বাগত জানানোর জন্য তখন কেউ প্রস্তুত ছিল না। ফলে এপারে এসেও তাদের কষ্টের সময় শেষ হয়ে গেল না। শিয়ালদা স্টেশন থেকে উদ্বাস্তু কলোনি প্রত্যেক জায়গায় তাদের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। নিজেদের অপহরণকারীদেরকে যেসব মেয়েরা স্বামী হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয় তাদের অবস্থা ছিল আরও বেশি করুণ।[৪] অপহৃতা নারীদের কথা চিন্তা করে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশ আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে, 'নারী পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন' নামে একটি কর্মসূচীর সূচনা করে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার 'অপহৃত ব্যক্তি (পুনরুদ্ধার ও পুনর্রপণ) আইন' প্রণয়ন করে। সরকার ঘোষণা করে, ১৯৪৭ সালের মার্চ এর পর যেসব মহিলাদের অপহরণ হয়েছে, তাদের পুনরুদ্ধার করে, পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে সরকার। মৃদুলা সারাভাইকে সমগ্র কর্মসূচীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। রামেশ্বরী নেহেরু, সুশীলা নাইয়ার, প্রেমবতী থাপার, ভাগ মেহতা, কমলাবেন প্যাটেল, দময়ন্তী সেহগল প্রমুখ সমাজ সেবিকাগণ এই কর্মসূচীতে অংশ নেন। প্রত্যেকটি পুনরুদ্ধার অভিযানের দায়িত্বে থাকতেন একজন মহিলা আধিকারিক, পুলিশ প্রশাসন তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করত।[৫]

সরকাররের এই কর্মসূচী মহৎ হলেও, অনেকক্ষেত্রে তা নির্যাতিতা মহিলাদের সহায় হয়ে উঠতে পারেনি। কয়েকজন মহিলা পরিবারের কাছে ফিরে যেতে অস্বীকার করে কারণ তাদের মনে হয়েছিল, তাদের পরিবার বা সমাজ কখনোই তাদের আবার ফিরিয়ে নিতে চাইবে না। আবার যেসব মেয়েদের তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া গিয়েছিল, তারাও তাদের পরিবারে বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেসব মহিলাদের অন্য সম্প্রদায়ের হাতে লাঞ্ছিতা হতে হয়েছিল, সমাজে তাদের অস্পৃশ্য হিসেবে গণ্য করা হত। সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পুকুর বা অন্যান্য পানীয় জলের উৎস তাদের ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। অপরদিকে যেসব মহিলাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যায়নি, তাদের বিভিন্ন সরকারি হোম বা আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে তারা স্বনির্ভর হয়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ লাভ করতে থাকে। কিন্তু হোমের জীবনকে কখনোই তারা নিজেদের পরিবার জীবনের সাথে মেলাতে পারেনি। হোমের মেয়েদের অনেকসময় ভিন্ন রাজ্যের অপরিচিত ব্যক্তির সাথে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত। আবার যেসব মহিলারা কোন নির্যাতনের শিকার হয়নি, সংসার চালানোর ক্ষেত্রে তাদেরও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বাঙালি পরম্পরা অনুযায়ী মেয়েদের দেবী অন্নপূর্ণার সাথে তুলনা করা হয়, সংসারে যত বড়ো বিপর্যয়ই আসুক তারা সমস্ত সদস্যদের দু-বেলা দু-মুঠো আহার তুলে দিতে পারবে এমনটাই তাদের কাছ থেকে আশা করা হয়। কিন্তু এপারে আসার পর উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে অনেকসময় অনাহারে দিন কাটাতে হত। পরিবারের মেয়েরা নিজেদের কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করতে পারছে না, এই কথা ভেবে মানসিক দিক দিয়ে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে থাকে, অনেকেই আত্মহত্যার দিকে পা বাড়ায়।[৬]

সহায়-সম্বলহীনা, একা মহিলাদের সংগ্রাম ছিল খানিকটা অন্যরকম। অর্চিত বসু গুহ চৌধুরী তাঁর গবেষণায় সেই ধরনের একজন মহিলা প্রমীলা বসুর কথা বলেছেন যিনি দেশভাগের সময় বরিশাল থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি যে বাসগৃহ পেয়েছিলেন তা তাঁর মনঃপুত ছিল না। তাঁর কথায়-

> "বরিশালের বাড়িটা বিশাল ছিল- কলকাতার বাড়িটা একদম ছোট ছিল আর ওটার জন্যও দুবছর লাগল। গভর্মেন্টের সময় আমাদের সময় নয়"।[৭]

প্রমীলা দেবীর মতো আরও অনেক বিধবা ও সহায় -সম্বলহীনা মহিলা ছিলেন, যাঁরা নিজের থেকে উদ্যোগী হয়ে নিজস্ব বাসভূমির স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা যে এক কামরার বাড়ি পেয়েছিলেন তাতে কোন আন্দরমহল ছিল না, ছিল না আব্রু রক্ষার কোন ব্যবস্থা, সেইসাথে ছিল উঁচুতলার সমাজ থেকে নীচুতলায় নেমে যাওয়ার ভয়। প্রমীলা দেবীর কথায়-

> "কলকাতা আসার পর দেখলাম ছোট অন্ধকার ঘর। বিশাল শহর আর তারমধ্যে আমি একটা প্রাণ। ভয় পেয়েছি আমি। উপর থেকে নীচে এসে গেলাম"।[৮]

মেয়েরা বেশিদিন এই অসম্মান ও লাঞ্ছনা নিয়ে বেঁচে থাকেনি, একসময় নিজেদের ও সংসারের প্রয়োজনে তাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতেই হয়। হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার এদেশে আসার পর স্বভাবতই কর্মক্ষেত্রে এক প্রতিযোগিতার বাতাবরণের সৃষ্টি হয়। এর পরোক্ষ প্রভাব হল, পুরুষ কর্মীদের বেতন অনেক কমে যায়, সংসার চালানোর জন্য যা যথেষ্ট ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে পরিবারের মেয়েদের চাকরির সন্ধানে বাড়ির বাইরে পা রাখতে হয়।[৯] ঔপনিবেশিক যুগে মেয়েদের চাকরি করাকে সমাজ কখনোই ভালো চোখে দেখেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খাতা' গল্পে প্যারিমোহনের তার স্ত্রী উমার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি, "শামলা ফরমাশ দিতে হইবে, গিন্নি কানে কলম গুঁজিয়া আপিসে যাইবেন"-যেন, নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি সমগ্র সমাজের মনোভাবেরই প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু দেশভাগের

পর এই অবস্থার অনেকখানি বদল ঘটল। উদ্বাস্তু পরিবারগুলি আর্থিক টানাপোড়েনের কাছে হেরে গিয়ে, বেশিদিন এই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে থাকতে পারল না। মেয়েরা যাতে একটি সম্মানজনক চাকরি পেতে পারে তার জন্য তারা মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী হল। জয়া চ্যাট্টার্জীর মতে, ১৯৫০ সালে উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।[১০] শিক্ষকতার পেশাকে সবথেকে সম্মানজনক পেশা মনে করা হত। স্বভাবতই এই পেশায় প্রতিযোগিতার মাত্রা ছিল অনেকবেশি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিদিশা' উপন্যাসে সেই চিত্র ধরা পড়েছে-

> "অথচ পাঁচ-সাত বছর আগেও এমন ছিল না। মেয়েদের স্কুলে একটি ভালো টিচার পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল, একজন গ্র্যাজুয়েটকে দু-তিনটি স্কুলে টানাটানি করত। কিন্তু রাতারাতি সব বদলে গেছে। পার্টিশন। পূর্ববঙ্গের ঘরছাড়া মানুষ বন্যার মতো এসেছে কলকাতায়, জীবিকার সংগ্রাম হয়েছে নির্মমতম। আজ আর বি.এ, এম.এ এদের সেধে আনতে হয় না, মেয়েদের ইস্কুলের দরজায় তারা ধরনা দিয়ে বেড়ায়। পঁচিশ টাকা, ত্রিশ টাকা, চল্লিশ টাকা- কিছুতেই আপত্তি নেই। একটা কিছু পেলেই হল- অনিশ্চয়তার চোরাবালির ওপরে সংকীর্ণতম শক্ত ভিত্তি একটুখানি"।[১১]

শুধুমাত্র শিক্ষকতার পেশা নয়, মেয়েরা ছড়িয়ে পড়ে আরও নানা দিকে। গার্গী চক্রবর্তীর মতে, মধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়েরা অফিস-কাছারি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক, বিমা কোম্পানী, খাদ্য দপ্তর, সেলস্, পুলিশ বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে পড়ে।[১২] ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জন পরিষেবা দপ্তরের সমস্ত কর্মীদের মধ্যে ১৫ শতাংশ ছিল উদ্বাস্তু মহিলা।[১৩] নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘ, মহিলা সেবক সংঘ, বামপন্থী মহিলা সংগঠন- মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি মহিলা সংগঠন এগিয়ে আসে এই দুঃস্থ পরিবারের মেয়েদের সাহায্যের জন্য। এইসব সংগঠন মেয়েদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে জীবন-জীবিকার সংগ্রামের উপযুক্ত করে তোলে।[১৪] লেখাপড়া না জানা মেয়েরাও পিছিয়ে রইল না। তারা সংসারে থেকে যে সমস্ত কাজ শিখেছিল, সেগুলিকেই ব্যবসায়িক রূপ দিতে শুরু করল। বাড়িতে বসে তারা আচার, পাঁপড়, বড়ি,ঠোঙা বানিয়ে বিক্রি করতে লাগল, কেউ কেউ বিড়ি বাঁধতে শুরু করল, কেউ আবার ট্রেনে বাসে হকারি করতে লাগল।[১৫] বিশ শতকের শুরুতে প্রত্যেক বাঙালী পরিবারে গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করার জন্য প্রধানত বিহার, উড়িষ্যা বা যুক্তপ্রদেশ থেকে আগত একজন পুরুষ ভৃত্য থাকত। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু মহিলারা এই পুরুষ কর্মীদের স্থানে নিযুক্ত হতে থাকে। এর প্রধান কারণ হল ছোট ছোট পরিবারে যেখানে স্বামী- স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে সেখানে বাচ্চাদের দেখাশুনা, রান্না -বান্না প্রভৃতি কাজের জন্য মহিলারাই ছিল উপযুক্ত, অন্যদিকে উদ্বাস্তু মহিলাদের বেতনও ছিল অন্য প্রদেশ থেকে আসা পুরুষদের তুলনায় যথেষ্ঠ কম।[১৬]

বিনোদনের জগতেও উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্র-শিল্পী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, যাত্রা-শিল্পী জ্যোৎস্না দত্ত, রীণা দাশগুপ্ত, নৃত্যশিল্পী আরতি দাস ওরফে মিস শেফালি সকলেই উদ্বাস্তু পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন এবং পরবর্তীকালে অত্যন্ত সফল হয়েছিলেন। ভানু বন্দোপাধ্যায়ের সাহায্যে প্রথম থিয়েটারে অভিনয় করার সুযোগ পান সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম অভিনীত নাটক 'নতুন ইহুদি' ও প্রথম অভিনীত চলচ্চিত্র 'পাশের বাড়ি'। তাঁর কথায় বারবার উঠে এসেছে উদ্বাস্তু জীবনের কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা-

> "এক সম্ভ্রান্ত স্বচ্ছল পরিবারের কাঠামোর খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে বড় হওয়া মেয়েটাকে প্রায় ভিখিরির মতো দিনের পর দিন অর্ধাহারে, অনাহারে সামান্য রুমালের মতো একফালি একটা খোলার ঘরে পুরো

পরিবার নিয়ে থাকতে হয়েছে। পেটের জ্বালায় যে কোনও কাজ করে বাঁচতে হয়েছে। স্টুডিওর ভিড়ে দাঁড়িয়ে দালালকে পাঁচ টাকা দিয়ে নিজে পাঁচ টাকা নিয়ে ঘরে ফিরেছি"।[১৭]

প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল মিস শেফালির। তাঁর কথায়-

"মা লোকের বাড়ি কাজ করে, বাবা রোজগারের তাগিদে সারাদিনই ঘরের বাইরে, তবু সংসারের অভাব মেটে না।....তখন থেকেই ভাবতাম, আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। নিজে রোজগার করতে হবে। ভাবতাম, একটা বড় চাকরি করব আমি। বাবা-মা কে দেখব, সংসারের দায়িত্ব নেব"।[১৮]

মেয়েদের চলার পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। বারবার প্রত্যাখ্যান, তির্যক মন্তব্য, কুরুচিকর আক্রমণ সমস্ত কিছু নিয়েই তারা এগিয়ে গিয়েছে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে কিরূপ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তা জানা যায় তাঁর আত্মকথন থেকে-

"ওদের (আত্মীয় স্বজন) চোখে আমি তখন একটা খারাপ মেয়ে....পুরুষের সঙ্গে এক সঙ্গে নাটক করছি মানেই আমি উচ্ছন্নে গিয়েছি...."।[১৯]

বিবাহিতা মেয়েদের সমস্যা ছিল আরও বেশি। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ১৯৪০ এর দশক থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত কর্মসংস্থান বিস্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিবাহিতা মহিলাদের অংশগ্রহণ সেই তুলনায় বাড়েনি। এ থেকে প্রমাণিত হয় বিবাহিতা মহিলাদের সংসারে শান্তি বজায় রাখার জন্য অনেক সময় চাকরি ছাড়তে হত। বিভিন্ন সংস্থা এইসব জটিলতার কারণে বিবাহিতা মহিলাদের নিয়োগ করতে চাইত না। টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলিতে এই কারণে অবিবাহিতা মহিলাদের টেলিফোন অপারেটরের কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হত। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা' গল্প পরবর্তীকালে 'মহানগর' নাম দিয়ে সত্যজিৎ রায় যার চলচ্চিত্রায়ণ ঘটান সেখানে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের বউ আরতিকে কিভাবে সংসার ও কর্মক্ষেত্র দুই জায়গাতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা দেখতে পাওয়া যায়।[২০]

তবুও হাজার বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, এক কঠিন বর্ম দ্বারা নিজেদের আচ্ছাদিত করে মেয়েদের এগিয়ে যেতে হয়। হয়তো তাদের উদ্দেশ্য আত্মমুক্তি ছিল না, নারীর ক্ষমতায়নের ধ্বজা ওড়ানোও হয়তো তাদের লক্ষ্য ছিল না। সংসারের আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসার মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদের মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁদের এই আত্মপ্রকাশ বাঙালি সমাজকে পরিবর্তনের দিকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। ভারতীয় সমাজে জন্ম নেয় এমন এক কর্মসংস্কৃতি -পুরুষ মহিলারা যেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে কাজ করার নজির গড়ে। তাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা স্থায়ীভাবে বাস করতেন সেইসব মেয়েরাও এগিয়ে আসেন।

তথ্যসূত্র:

১। Nehru, Jawaharlal. Jawaharlal Nehru's Speeches. Vol.1. September 1946- May 1949. Delhi. Government of India. Ministry of Information and Broadcasting. 1958. p. 25

২। চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার, প্রান্তিক মানব (অনুবাদ), কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ১৯৯৩, পৃ: ১৭

৩। Sengupta, Anwesha. "Looking Back at Partition and Women: A Factsheet". Peace Print: South Asian Journal of Peacebuilding. 4.1. (2012).

http://www.wiscomp.org/peaceprints.htm.

৪। Nittali, Kiran Kumar. "The Partition of India: Through the Experience of Bengali Refugee Women". The Criterion: An International Journal of English. 4.3. (2013). p.3.

৫। Sengupta, Anwesha. Op.cit.

৬। Nittali, Kiran Kumar. Op.cit. p.3

৭। Basu Guha Choudhury, Archit. "Engendered Freedom: Partition and East Bengali Migrant Women". Economic and Political Weekly. 44.49.(2009). p. 68

৮। পূর্বোক্ত:

৯। Chakravarty, Ishita & Chakravarty Deepita. "For Bed and Board Only: Women and Girl Children Domestic Workers in Post Partition Calcutta (1951-1981)". Modern Asian Studies. 47.1. (2013). p. 599.

১০। Chattarjee, Jaya. Spoils of Partition; Bengal and India, 1947-67. Cambridge. Cambridge University Press. 2007.p.145.

১১। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী-০৯, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৬৫ (বঙ্গাব্দ), পৃ: ২৬।

১২। Chakravarty, Gargi. Coming Out of Partition: Refugee Women of Bengal. New Delhi. Bluejay Books. 2005.p.88-89.

১৩। Chakravarty, Ishita & Chakravarty Deepita. Op.cit. p. 599.

১৪। Mookherjee-Leonard, Debali. Literature, Gender and The Trauma of Partition -The Paradox of Independence. New York. Routledge.2017. p. 79

১৫। Nittali, Kiran Kumar. Op.cit. p. 4

১৬। Chakravarty, Ishita & Chakravarty Deepita. Op.cit. p. 597

১৭। চক্রবর্তী, ঈশিতা, "জীবনযোদ্ধা না কি ভাঙা স্বপ্নের নায়িকা- কোন জন সত্যি?", পরবাস, সংখ্যা ৭৫, (২০১৯,জুন ৩০) .http://parabas.com/PB75/LEKHA/brlshita75.shtml.

১৮। মিস শেফালি, সন্ধ্যারাতের শেফালি, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃ: ৮-৯

১৯। চক্রবর্তী, ঈশিতা, পূর্বোক্ত.

২০। Mookherjee-Leonard, Debali. Op.cit. p. 91